শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা

স্বপনকুমার ঘোষ

ইংরেজি বছর যখন ফুরিয়ে আসে, কনকনে হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরতে থাকে, ঠিক তখনই নবীন সাজে সেজে ওঠে পৌষমেলা, শান্তিনিকেতন তীর্থের সেরা পরব। সাতই পৌষে রাঙামাটির রৌদ্রছায়ায় ঢল নামে মানুষের। অসীম বৈচিত্র নিয়ে আজও প্রাণবন্ত হয়ে আছে পৌষমেলা। সকলের সঙ্গে আন্তরিক আলিঙ্গনের সদিচ্ছায় একেবারে দুহাত বাড়িয়ে শন্তিনিকেতনের পৌষমেলা প্রতিবারই ডাক দিয়ে যায় নিজের নিয়মে।

আজ থেকে একশো পনের বছর আগে স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯৪ সালে শান্তিনিকেতনের *উপাসনাগৃহ* মন্দিরের সামনে উত্তর দিকের মাঠে প্রথম যে পৌষমেলার সূচনা হয়েছিল, আজ তা সারা দেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি প্রধান সাংস্কৃতিক সেতু ও মিলনমেলায় রূপ নিয়েছে।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলের গ্রামবাংলার মানুষকেই টানে না, সাতই পৌষের টানে শহর ও শহরতলীর মানুষের মন চলে যায় "সব পেয়েছির দেশ" শান্তিনিকেতনে। পৌষমেলা আজ আর শুধু গ্রামের নয়, শহরের এবং মহানগরীরও। দেশ-বিদেশের মানুষজনদের মন আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে পৌষমেলায় হাজির থাকবার জন্য।

বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির সঙ্গে পৌষমেলা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, আজ তা বঙ্গ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। পৌষমেলা এখন আর কেবলমাত্র শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী তথা বীরভূম জেলার কোনো স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠান নয়। পৌষমেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে, স্বীকৃতিও লাভ করেছে। সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এই ধরনের বিশাল মেলা ও উৎসবের আয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণের এই মেলা ও উৎসব সারা বিশ্বের মধ্যে অনন্য, ব্যাতিক্রম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কেন পৌষমেলার শুরুর দিনটি সাতই পৌষ ? এই প্রসঙ্গে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন।"

সাতই পৌষ দিনটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক স্মরণীয় পুণ্যদিন, এ তাঁর দীক্ষার দিন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা দিবস সাতই পৌষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। কিন্তু এই মেলার সঙ্গে ধর্মের কোনোরকম সম্পর্ক নেই। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তামাম বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ পৌষমেলায় আসেন, মহর্ষির ধান্যবেদী ছাতিমতলার উপাসনাতে যোগ দেন।

পশ্চিমবাংলা ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের গ্রামীণ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি নানান শিল্পকর্ম নিয়ে আসেন পৌষমেলায়। মেলা প্রাঙ্গনে তাঁদের সৃষ্টিকে সবার কাছে মেলে ধরেন। আউল বাউল ফকির কবিয়াল গ্রামীণ লোকসংগীত শিল্পীরা বিনোদন মন্ডপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে যোগ দেন। তাঁদের সবার কাছে প্রতিবছর এই পৌষমেলায় আসা, একেবারে তীর্থযাত্রার মতন। এখানে এই সব গ্রামীণ লোকশিল্পীদের সঙ্গে শহরবাসীর আন্তরিক যোগাযোগের সুযোগে পল্লী সংস্কৃতি বিশেষভাবে সুসংহত ও শক্তিশালী হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাতই-আটই-নয়ই পৌষ আশ্রমে সারা বছরের মধ্যে তিনটি রঙীণ দিন। এই তিনটি দিনকে আশ্রমিকরা বলে থাকেন সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী. পৌষ-মেলায় ঠিক যেন শারদ উৎসবের আনন্দ। এই সময় সীমাহীন আকাশের রং হয়ে থাকে গাঢ় নীল। আর পাকা ধানের রংয়ের মতন রোদের রংয়ে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে আশেপাশের গ্রামগুলি ঝলমল করে।

পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনাপর্বের ইতিহাস সম্পর্কে একালের উৎসবমুখী মানুষের মন খুব স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহলী হয়। পৌষমেলা ও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা পর্বের ইতিহাসের দিকে আমরা এবার একটু ফিরে তাকাব।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে ১৮৬১ সালে (১২৬৮ সন) তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভুবনমোহন সিংহের আমন্ত্রনে বোলপুর থেকে মাইল কয়েক দূরে রাইপুর গ্রামে যাবার পথে এই জায়গার নির্জন সৌন্দর্য দেখে রীতিমতন অভিভূত হয়েছিলেন। সেকালের এই নির্জন প্রান্তরের সপ্তপর্ণী গাছের ছায়ায় এই স্থানটিকে মহর্ষিদেব ব্রহ্ম উপাসনার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

১২৬৯ সনের ১৮ ফাল্গুন বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভুবনডাঙ্গা গ্রামের কুড়ি বিঘা জমির মৌরসি পাট্টা গ্রহণ করেন রাইপুর গ্রামের ভুবনমোহন সিংহ-র কাছ থেকে। সেই বছরেই একটি অতিথিশালায় ভিত স্থাপিত হয়, মহর্ষিদেব এর নাম রাখেন "শান্তিনিকেতন" বা "Abode of Peace"। যা এখন আমাদের সবার কাছে "শান্তিনিকেতন বাড়ি" নামে পরিচিত। ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারী- মার্চ মাস নাগাদ মহর্ষিদেব তাঁর "শান্তিনিকেতন-আশ্রম" আবিষ্কার করেন। তিনি ছাতিমতলায় সন্ধান পান- "প্রাণের আমার, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"। পরের বছর মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ। এর পঁচিশ বছর বাদে ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "ট্রাষ্ট ডীড" বা "ন্যায়পত্র" সম্পাদন করে "শান্তিনিকেতন আশ্রম" সকলের জন্য উৎসর্গ করেন। ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর, ১২৯৮-এর সাতই পৌষ উপাসনা মন্দির একুশে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪৩ সালের একুশে ডিসেম্বর, ১২৫০ বঙ্গাব্দের সাতই পৌষ বৃহস্পতিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কুড়িজন অনুরাগীসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষির আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরবর্তী দু-বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচশো জন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও সাফল্যের কারনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে ইচ্ছে জেগেছিল যে, দীক্ষিত সব ব্রাহ্মদের নিয়ে একটি মেলা ও উৎসব আয়োজন করবার।

১৮৪৫ সালের ২০ ডিসেম্বর সাতই পৌষ শনিবার কলকাতার কাছে পলতার গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদের নিমন্ত্রন করে মহর্ষিদেব একটি মেলা ও মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই হল প্রথম সাতই পৌষের মেলা। সেই মেলা বসেছিল কলকাতায়, শান্তিনিকেতনের মন্দির সংলগ্ন মাঠে নয়। এই মেলার স্রষ্ঠা ও উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

১৮৯১ সালের সাতই পৌষ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পৌষ উৎসবের সূচনা। সেই বছর শুধু "উৎসব"-ই উদযাপিত হয়েছিল, "মেলা" অনুষ্ঠিত হয়নি।

মহর্ষিদেবের ট্রাষ্ট-ডীডের নির্দেশ অনুযায়ী ১৮৯৪ সালের ২১ ডিসেম্বর সাতই পৌষ শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌষ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আয়োজিত হয় প্রথম পৌষমেলার। ছাতিমতলা ও মন্দিরের উত্তর দিকের মাঠে দোকান পসার সাজিয়ে

শান্তিনিকেতনে প্রথম পৌষমেলা বসেছিল।

প্রথম বছর আর্থিক খরচের পরিমান ১৭৩২ টাকা ১০ আনা। প্রায় ছয়শো গানের কাগজ ছাপান হয়েছিল। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে কখনো এসে স্বচক্ষে পৌষমেলা দেখেননি। ১৯০১ সালের বাইশে ডিসেম্বর, ১৩০৮ সনের সাতই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরের সাংবাৎসরিক উপাসনা শেষকরে, রবীন্দ্রনাথ এক বৈদিক উপাসনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর, তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে প্রধান রূপকারও। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন পৌষমেলারও প্রেরণার উৎস। সাতই পৌষ এই দিনটি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে। পৌষমেলার প্রতি কবির শ্রদ্ধা, অনুরাগ, প্রেরণা ও উৎসাহর পেছনে ছিল - কবির প্রথম জীবনে, নবগোপাল মিত্র-র উদ্যোগে আয়োজিত "ন্যাশনাল" বা হিন্দুমেলা-র নানান স্মৃতি ও অভিঙ্গতা।

রবীন্দ্রনাথ বছরের পর বছর এই স্মরণীয় পুন্যদিনটিতে মহর্ষিদেবের দীক্ষা উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে উপাসনায় ভাষণ দিয়েছেন। তিনি পৌষ উৎসবের প্রথম দিকে সংগীত পরিবেশন করেছেন। কবির জীবনের শেষ পৌষ উৎসবের দিনে ১৯৪০ সালের (১৩৪৭) সাতই পৌষ অসুস্থতার দরুণ রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতে পারেন নি। বার্ষিক পৌষ উৎসবের জন্য কবির অনুমোদিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। ছয়ই পৌষ রাত্রে বৈতালিক দলের গান। সাতই পৌষ সকালে ছাতিমতলায় উপাসনার মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপি পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনা। বিকেলে উদয়ন প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান। আলাপিনী মহিলা সমিতির শ্রেয়সী পত্রিকার উদ্বোধন। আটই পৌষ সকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনতীর্থ আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব এবং পাঠভবন, শিক্ষাসত্র ও উত্তরশিক্ষা সদনের নিদর্শপত্র প্রদান অনুষ্ঠান।

নয়ই পৌষ আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা ও উৎসবের শেষদিন। সকালে আম্রকুঞ্জে স্মরণ করা হয় পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের।এরপর আশ্রমিক সংঘ ও বিশ্বভারতী অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা। বিকেলে প্রাক্তনীদের অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠান। বড়দিনে শান্তিনিকেতনে খ্রিষ্ট উৎসব - পৌষমেলার শেষ আনন্দ। বিশ্বপথিক মহামানব যীশুর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাতে সকলে এসে সমবেত হন মন্দিরে খ্রিষ্ট উৎসবের উপাসনায়।

বিনোদন-পৌষমেলার একটি বিশিষ্ট দিক। বাংলার লোকসংস্কৃতির বহমান ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস দেখা যায়। দেশের বাউল ও গ্রামীণ শিল্পীরা তাঁদের জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক জনসমক্ষে তুলে ধরেন। বাউল, মনসামঙ্গল, কবিগান, ফকিরদের গান, সত্যপীরের পাঁচালী, লোকনৃত্য, গম্ভীরা - এসব অনুষ্ঠান পৌষমেলার বিনোদন মন্ডপে গ্রাম আর শহরের মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি বসে প্রত্যক্ষ করেন নিবিড়ভাবে।

দীর্ঘ বছর ধরে পৌষমেলার বিনোদন উপসমিতির প্রধান হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও রবীন্দ্র স্নেহধন্য শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্র সংগীতের আচার্য প্রয়াত শান্তিদেবের বিশেষ উদ্যোগ ও ভাবনাচিন্তার ফলেই বিনোদনের আকর্ষণ এক অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে।

সানাই বাদক তিনদিন ধরেই সুরের মায়াজাল বোনেন। যাত্রাভিনয় চলে তিন

রাত্রি ধরে। আটই পৌষ রাত্রে আতসবাজির নানা রংয়ের আলোর মালায় শান্তিনিকেতনের আকাশ রঙীন হয়ে ওঠে। মেলায় সাঁওতালদের খেলাধুলো বিশেষ আকর্ষণ। সাঁওতালদের দেখা যায় মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে প্রানোচ্ছল সহযাত্রিনীদের সঙ্গে বাঁশির সুরে আর দ্রিম দ্রিম শব্দে মাদল বাজিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে আসতে।

মেলাপ্রাঙ্গনে স্টলের সংখ্যা প্রায় হাজার দুয়েকের কাছাকাছি। মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ "কালোর দোকান" - শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে দেশের মানুষজনের কাছে একটা কিংবদন্তীর মতন। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রীর দোকান বসে। গত একযুগে কফির স্টল, পাঞ্জাবীর দোকান, টেপরেকর্ডার, টিভি আর ইলেকট্রনিক্সের দোকান বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। হোটেল রেস্তরা থেকে শুরু করে কাশ্মিরী সালের দোকান। এখন মোগলাই পরোটাকে টেক্কা দিয়েছে চাউমিন আর চাউচাউ। এছাড়া মোমো আর দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে গেছে।

টুপি, বেতের ছড়ি, কারুশিল্প মনোহারী, জুয়েলারি, কাঠের বাসন, মিষ্টি, তেলেভাজা ও জিলিপির দোকানের সঙ্গে দুমকা থেকে আসে মাটির হাঁড়ি-কলসি-ফুলের টব, বাঁশের ডালা, ধামাকুলো আর শিলনোড়ার দোকানীরা। কাঠের ও কাঁচের শৌখিন জিনিসপত্রর দোকান বসে। সাবেকি নাগরদোলার সঙ্গে বৈদ্যুতিক নাগরদোলা। সার্কাস, চিড়িয়াখানা আর টয় ট্রেন তো আছেই।

নানান প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে বিশ্বভারতীর মন্ডপ। ডোকরা, পট, শোলা, টেরাকোটা, বাঁশ, বেত শিল্পীরা মেলা প্রাঙ্গনেই তাঁদের শিল্প সৃষ্টি মেলা-যাত্রীদের কাছে মেলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৌষমেলা কমিটি থেকে হস্তশিল্পী ও গ্রামীণ কলাকুশলীদের বিগত বছরের তুলনায় এবারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জন্য মেলার মাঠে এবছর বেশি পরিমানে জায়গা দিয়েছেন।

পৌষমেলার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে প্রবীন আশ্রমিকরা অনেকেই বলে থাকেন যে, পৌষমেলা তার আদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছে। আবার অনেকে বলে থাকেন যে, একসময় এই মেলা শুরু হয়েছিল গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের শিল্পকর্মের বিপণনের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেকালের পৌষমেলার সঙ্গে আজকের মেলার অনেকটাই ফারাক ঘটে গেছে। আজকের সেই পৌষমেলা আধুনিকতার জ্বরে আক্রান্ত। বলতে গেলে, বিজ্ঞাপনের মোড়কে পৌষমেলার মুখ ঢেকে যায়।

তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌষমেলা যে তার গ্রামীণ চরিত্র হারিয়েছে তা কিন্তু মেলা কতৃপক্ষও মেনে নেন। পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্ক আছে, বিতর্ক থাকবেও। তবে একথাটা ঠিক যে, কিছু ব্যবসায়ী পৌষমেলাকে তাদের বানিজ্যিক প্রচারের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পৌষমেলার নানা তোরণে, মেলার অনেক স্টলে আধুনিক দ্রব্যাদির সমাবেশ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গ্রামীণ লোকশিল্পীদের কারুকার্য এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর পাঁচটা শহরের মেলার মতন পূর্বপল্লীর বিশাল মেলা প্রাঙ্গণের চত্বরটি নামী-দামী মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর শো-রুম, নানান হোর্ডিং-এ কেমন যেন নাগরিক মেলার রূপ নেয়। যা কিনা শান্তিনিকেতনের রুচি ও শৈল্পিকবোধের পরিপন্থী।

তবে রবীন্দ্রনাথের যুগে যে আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে মেলা শুরু হয়েছিল, সে-যুগ এখন আর নেই। তখন পৌষমেলা ছিল মূলত গ্রামেরই মেলা। এখন নতুন যুগে গ্রাম ও শহরের একাকার হবার মেলা। দুয়েরই ভালো দিকে মেলামেশা হোক। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে পৌষমেলাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা যেতে পারে।